DEC. 26 2001

যুগান্তর

শাহজাহান মিয়া

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ কোন সমাধান নয়

সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা বলতেন। বিশেষ করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কথাটি তিনি জোর দিয়েই উল্লেখ করতেন। প্রয়োজনীয় সমর্থন লাভে ব্যর্থ এবং বিরূপ সমালোচনার ফলে তিনি পরে এ বিষয়ে তেমন কোন কথাবার্তা বলতে আর উৎসাহ বোধ করেননি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবার তার তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতারোহণের ৫৪তম দিনে গত ২ ডিসেম্বর অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়টি দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেন। শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি, অরাজকতা চলতে থাকলে প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরীহ ছাত্রছাত্রীও তাদের অভিভাবকরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধকে স্বাগত জানাতে ও সমর্থন করতেই বেশি আগ্রহী হবে বলে মনে হচ্ছে। ঠিক একই দিন পার্লামেন্টে ভাষণদানকালে বিএনপির মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার 'প্রয়োজনে আইন করে হরতাল বন্ধের' বক্তব্য জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে না হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনে কিছু ছাত্র ও ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা যেভাবে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তা মেনে নেয়ার কোন উপায় নেই এবং এই জঘন্য কাজটির আমি ঘোর বিরোধী। হরতাল গণতান্ত্রিক অধিকারেরই একটি অংশ। তবুও এ অস্ত্রটির অযথা অতি ব্যবহার এর কার্যকারিতা ইতিমধ্যেই অনেকাংশে হ্রাস করেছে। মানুষ হরতালকে যেন আর গ্রহণ করতে চাইছে না। তবে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে জনগণের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কোন হঠকারী, স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী সরকারকে হটানোর মতো কার্যকর কোন হরতাল পালনের বিপক্ষে আমি নই। তবে কোন গ্রহণযোগ্য ইস্যুতে হরতাল এখনও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন পেতে পারে। যেমন আইন করে হরতাল বন্ধ করার আয়োজন ও পাঁয়তারার কারণে মানুষের মনে সৃষ্ট তীব্র প্রতিক্রিয়া তাদের হরতাল পালনে আরও উদ্যমী ও উৎসাহী করে তুলতে পারে। অর্থাৎ হরতাল পালন করেই আইন প্রণয়ন করে হরতাল বন্ধের অপপ্রয়াস নস্যাৎ করে দিতে পারে। বিশিষ্ট রাজনীতিকসহ অনেকেই বলেছেন যারা আইন করে হরতাল বন্ধ করার হুমকি দিতে পারেন, তারা আইন করে গণতন্ত্রকেও বন্ধ করার প্রয়াস চালাতে পারেন।

দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের অগ্রপথিক ছাত্রদের একটি গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। ছাত্রদের নেতৃত্বে অনেক সময় দেশের মানুষ অনেক আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। ছাত্র নামধারী কিছু সন্ত্রাসী আজ তাদের ঘৃণ্য তৎপরতার মাধ্যমে ছাত্রসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ম্লান করে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদলের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতেই এই সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেছেন। তাতে অনেকেই খুশি হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এতেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? না, হবে না। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আগে বিএনপি নেতৃত্বকে অবশ্যই তাদের ছাত্র ফ্রন্টের নেতাকর্মীদের মধ্যে যে মহা সমস্যা রয়েছে তার প্রতি নজর দিতে হবে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এবার বিএনপি ক্ষমতারোহণের আগেই ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা কিভাবে সারাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করায় কোন বাহাদুরি নেই।

জননী জন্মভূমির ডাকে দেশের মূল শক্তি– ছাত্র ও যুব শক্তি '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে '৬২-এর শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও '৬৯-এর দুর্বার গণআন্দোলনসহ '৭১-এর মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বলতে দ্বিধা নেই যে, ১৯৭৫ সালে জাতির পিতার হত্যার মাধ্যমে এদেশে শুরু হয় সন্ত্রাসের রাজনীতি। এক সন্ত্রাস জন্ম দেয় শত সন্ত্রাসের। নতুন নতুন সামরিক ও স্বৈরশাসক তাদের শক্তি সংহত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বশ করার তৎপরতায় নেমে পড়ে তারা। ক্ষোভ-লালসার জালে বন্দি করা হয় ছাত্রদের। শুরু হয় অস্ত্রের ঝনঝনানি। ঘটতে থাকে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। এই পদস্খলনের জন্য ছাত্ররা সম্পূর্ণভাবে নিজেরা দায়ী নয়। দায়ী অনেকাংশে রাজনীতিবিদরা ও রাজনৈতিক শক্তি। স্বাধীনতার পর, বিশেষ করে পঁচাত্তর-পরবর্তী সময় থেকে রাজনৈতিক প্রভাব ও রাজনীতিবিদদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এই অবক্ষয় ঘটতে থাকে। দীর্ঘ সামরিক ও স্বৈরশাসনের পর নব্বই দশকের শুরুতে দেশ যখন অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ও কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের পথে নবযাত্রার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করে তখনই লক্ষ্য করা যায়, অশুভ অপশক্তি ও সন্ত্রাসের গডফাদাররা ছাত্রদের ওপর আস্তে আস্তে ভর করতে শুরু করছে। মেধা ও প্রতিভা বিকাশের পরিবর্তে ছাত্ররা অস্ত্রবাজিতে মত্ত হয়ে পড়ছে। কলম ও মস্তিষ্ক চালিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং যশ ও খ্যাতি অর্জনের চেয়ে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে ভাগ্য গড়া ও আয়-উপার্জন এদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

> ছাত্রদের নিজেদেরই রাজনৈতিক প্রভাবের রাহুগ্রাস থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। কোন শক্তির স্বার্থ হাসিলের ক্রীড়নক হিসাবে নিজেদের ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দিতে হবে।

মুষ্টিমেয় কিছু ছেলের কার্যকলাপ গোটা শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করে ফেলে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন দলের অস্ত্রবাজ ও অস্ত্রধারী ক্যাডারদের হাতে হয়ে পড়ে জিম্মি। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় অস্ত্রধারীদের অভয়ারণ্যে। পরিণত হয় অস্ত্রের দুর্গে। অথচ দেশের ছাত্ররা ১৯৪৮ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বাঙালিদের ওপর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেয়ার আপত্তিকর উক্তি ও আস্ফালনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়া থেকে ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার হটাও আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি সংগ্রামে যে সংগ্রামী চেতনা ও শৃঙ্খলাবোধ দেখিয়েছে দেশবাসীর স্মৃতিতে তা চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। জেল-জুলুম-মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ওরা কোনদিন সাহস হারায়নি। পিছপা হয়নি।

সন্দেহ নেই দেশের সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সফল করে তুলেছিল। ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, প্রকৌশলীসহ অন্যান্য পেশাজীবী-শ্রমজীবী সব মানুষ তাদের অবদান রেখেছেন। কিন্তু একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সংগ্রামী ছাত্ররাই ছিল ওই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। তাদের দৃঢ় ঐক্য জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করেছিল। ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য স্বৈরাচার খেদাও আন্দোলনে আমি রাজনৈতিক দলগুলোর ইস্পাতকঠিন ঐক্যকে কোনমতেই খাটো করে দেখছি না। তবে ছাত্রদের বিশেষ ভূমিকার কথা কারও ভুলে যাওয়ার কথা নয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আন্দোলনমুখর ১৯৯০ সালের ২৬ নভেম্বর সংঘটিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করছি : ২৬ নভেম্বর বিকালে জিরো পয়েন্টে ছাত্রঐক্যের সভা। ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও সভায় যোগ দেয়। দুপুরে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে ছাত্র নামধারী এরশাদের পদলেহনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বাঁশের লাঠি দিয়ে ওই সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করছে। ২২টি ছাত্র সংগঠন নিয়ে গঠিত ছাত্রঐক্য এ অবস্থার মধ্যেও তাদের নির্ধারিত সভা ছাত্র-জনতার বিপুল উপস্থিতিতে চালিয়ে যায়। প্রত্যেক ছাত্র সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক) বক্তব্য রাখে। বাংলাদেশে বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ পেলে একটু বেশি সময় নেয়ার একটা সহজাত প্রবণতা প্রায় সবার মধ্যেই আছে। কিন্তু না, ওইদিন ওরা অদ্ভুত শৃঙ্খলাবোধ দেখিয়ে ওদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত তিন মিনিটের বেশি কেউ বলেনি। বায়তুল মোকাররম মসজিদে আজান শুরু হওয়ার ৩০ সেকেন্ড আগে সভার সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে। সভার শেষ ঘোষণা মোতাবেক অভি-নীরু ও তাদের ক্যাডারদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়ার জন্য হাজার হাজার ছাত্রের মিছিল এগিয়ে চলল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিল জনতা। এগিয়ে চলল জঙ্গি মিছিল। আমরাও ছুটলাম পেছন পেছন। দোয়েল চত্বরেই মুখোমুখি হতে হল সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের। পেছনে মিছিলের শক্তির ওপর ভর করে কয়েক যুবক বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। হাতে ওদের লাঠি। মারমুখী যুবকদের ছুটে যাওয়া ও পেছনে জঙ্গি মিছিলের রুদ্র মূর্তিতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে অস্ত্রধারীরা মাইক্রোবাসে উঠে গা বাঁচায়। বিশ্ববিদ্যালয় চারদিক থেকে একযোগে আক্রান্ত হয়। সংগ্রামী ছাত্রীরাও তাদের ছাত্র ভাইদের সঙ্গে বাঁশের লাঠি ও কাঠের ফালি নিয়ে সামিল হয়েছিল প্রতিরোধের ওই কাফেলায়। জীবনকে বাজি রেখে প্রতিপক্ষের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে নির্গত বুলেট বৃষ্টি উপেক্ষা করে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় ওরা সামনের দিকে। প্রবল প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে অস্ত্রধারীরা শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়। জয় হয় মেহনতি ছাত্র-জনতার। ওইদিনই বুঝতে বাকি থাকেনি ছালাম-বরকত-রফিক-জাব্বারের উত্তরসূরি স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক বীর ছাত্রদের কেউ কোনদিন দমিয়ে রাখতে পারেনি এবং পারবেও না। ভেদাভেদ, মত-পথ ভুলে গিয়ে অভিন্ন লক্ষ্য হাসিলে তারা এক কণ্ঠে বজ্রনিনাদে গর্জে উঠেছিল– এরশাদের পতন চাই। এরশাদের পতন হয়েছিল।

কিন্তু আজ এ অবস্থা কেন! সবাইকে তা গভীরভাবে ভাবতে হবে। গলদ কোথায় তা খুঁজে বের করতে হবে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের মাধ্যমে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতে কালিমা লেপনের আগে বিষয়টির বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ খুশিই হবে। তারপরও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ কোন সমাধান নয়। এটা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধেও তেমন সহায়ক হবে না। বরং অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবের কথা মনে রেখে ছাত্রদের নিজেদেরই রাজনৈতিক প্রভাবের রাহুগ্রাস থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। কোন শক্তির স্বার্থ হাসিলের ক্রীড়নক হিসাবে নিজেদের ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। অছাত্রদের নেতৃত্ব থেকে বিদায় জানিয়ে মেধাবী যোগ্য নেতৃত্বকে বরণ করে নিতে হবে। দেশের রাজনৈতিক শক্তিকে ছাত্রদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ও গৌরবদীপ্ত ধারায় ফিরে যেতে সাহায্য করতে হবে। কারণ ছাত্র রাজনীতি কলুষিত হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভাবে। এই প্রভাব বলয় থেকে ওদের বেরিয়ে আসাই দরকার।

শাহজাহান মিয়া : সাংবাদিক, কলাম লেখক